মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৪

আমেরিকার মৌখিক ইতিহাস সম্মেলনে একাত্তরের গণহত্যা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম তা খুব দীর্ঘমেয়াদি না হলেও ছিল রক্তক্ষয়ী। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী এবং তাদের দোসররা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে সেই অপরাধের প্রমাণ লোপাটের জন্য দ্রুত মৃতদেহগুলো গণকবর দেয়। বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই গণহত্যার ইতিহাস, যা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তো অস্বীকার করাই হয়, পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতেও যে বিষয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাকর্মী বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার ইতিহাস বিভাগের পি-এইচডি গবেষক উম্মুল মুহসেনিন এই বিস্মৃত-অনালোচিত ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রন্থপাঠ উদ্‌যাপন

তোমার চোখে সুলতানার স্বপ্ন

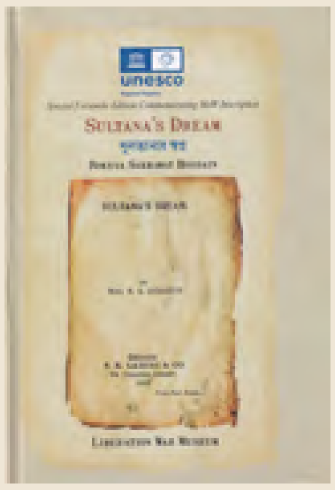

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’-এর ইউনেস্কো কর্তৃক *মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড* স্বীকৃতি উদ্‌যাপনের জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গণ-গ্রন্থাগারের সহযোগিতা ও সম্পৃক্তিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক বিশেষ পাঠ-উদ্‌যাপন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এখানে নির্বাচিত গ্রন্থাগারসমূহকে ‘সুলতানার স্বপ্ন’-এর বিশেষ সংস্করণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলো রোকেয়া ও তাঁর ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে কেন্দ্র করে নবীন পাঠকদের বিভিন্ন সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্দীপ্ত ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তরুণদের গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদালত ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কাছে একাত্তরের অস্পষ্ট এই অধ্যায়টিকে আরও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে এই গবেষণায়। প্রতিবেদনে উঠে আসা বিষয়গুলোর অন্যতম হলো বাংলাদেশের গণহত্যার ইতিহাসকে বিশ্বমানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত নির্মমতার মানচিত্রায়ণ।

গত ১৯ ও ২৬ অক্টোবর ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় জুনিয়র গবেষণা ফেলোশিপ-এর মধ্যবর্তী প্রতিবেদন উপস্থাপন কার্যক্রম। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর আয়োজনে এই প্রেজেন্টেশনে গবেষকগণ তাদের গবেষণার অগ্রগতি তুলে ধরেন, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, গণহত্যা, মানবাধিকার, এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়।

এখানে প্রতিটি দলে সদস্যগণ, তাদের মেন্টর এবং ডিফেন্স কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল হক উপস্থিত থেকে তরুণ গবেষকদের ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

হিমালয়ের ইমজাৎসে শৃঙ্গে জাদুঘর-কর্মী

হিমালয়ের দূর্গম পথে হেঁটে চলছি, সাথে আছে বাংলাদেশের লালসবুজ পতাকা। যেতে হবে বহুদূর, গন্তব্য ৬১৬৫ মিটার উচ্চতার আইল্যান্ড পিক বা ইমজাৎসে পর্বতের চূড়া। ১৯৫১ সালে ব্রিটিশ দলের এভারেস্ট অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এক বাঙালি পর্বতারোহী ড. গোপেন্দ্রনাথ দত্ত, পেশায় একজন ভূতত্ত্ববিদ। এরিক শিপটনের নির্দেশে নতুন পথের সন্ধানে চলে গেলেন ইমজা ভ্যালিতে। সেখানে ৬ অক্টোবর তিনি একটা পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেন। ভারতীয় পর্বতারোহণে এটাই ছিল প্রথম সলো এবং ভার্জিন পর্বত অভিযান। পরবর্তীতে দলনেতা এরিক শিপটন পর্বতটির নাম দেন আইল্যান্ড পিক।

হিমালয়ে আমার পথচলাটা শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে পর্বতারোহীদের সংগঠন অভিযাত্রীর হাত ধরে। প্রথম হিমালয় দেখার আনন্দে নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। একই বছর ভারতের নেহেরু ইন্সটিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং থেকে পর্বতারোহণের মৌলিক প্রশিক্ষণ নিতে চলে যাই উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করে পর্বত সমান স্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসি বাংলাদেশে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, করোনা মহামারীর কারণে মাঝখানে চলে যায় বেশ কয়েকটি বছর। ২০২২ সালে আবার বেরিয়ে পড়ি হিমালয়ের পথে, গন্তব্য মানাসলু সার্কিট, স্যম ভ্যালি। দলের সাথে হিমালয়ের বৈচিত্র্যময় আর রঙিন পথচলা শেষ করে একা একা চলে যাই অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকিংয়ে।

হিমালয় থেকে দেশে ফিরেই সেবার যুক্ত হই ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইমজাৎসে পর্বত চূড়ায় ইয়াসমিন লিসা

মুক্তিযোদ্ধা সুরকার সুজেয় শ্যাম স্মরণ

লিবারেশন ডকফেস্ট ২০১৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুজেয় শ্যাম

১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হই নজরুল আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী হিসেবে। আমার বড়ভাই চিত্তরঞ্জন ভুঞা ১৯৫৪ সাল থেকে বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। ঐ বেতারে সুজেয় শ্যাম দাদা সুরকার ও সংগীতশিল্পী ছিলেন। আমার বড় ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি। আমাকে ছোট বোনের মত স্নেহ করতেন। দাদার সুরে আমার বেশ কিছু আধুনিক গান গাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৭১ সালে দাদার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল, দাদার সুরে 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম, রক্ত চাই রক্ত চাই অত্যাচারীর রক্ত চাই' গান ছাড়াও আরও বেশ কিছু গানে আমি কণ্ঠ দিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দাদার সেই অমর সংগীতটি 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। ঐ গানে আমার ছোট বোন কণ্ঠ দিয়েছে। দাদা অনেক গুণী সুরকার ছিলেন। গত ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তিনি পরলোক গমন করেন। দাদার আত্মার শান্তি কামনা করছি। দাদা ওপারে ভালো থাকবেন।

জয়ন্তী লালা (কণ্ঠযোদ্ধা)
সভাপতি, নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সংস্থা, চট্টগ্রাম
উপাধ্যক্ষ, আর্য সঙ্গীত সমিতি, চট্টগ্রাম

সিএসজিজে'র ১৪তম মাসিক বক্তৃতা

গণহত্যার স্বীকৃতিতে কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রয়াস

ড. কাউসার আহমেদ

গত ২ নভেম্বর ২০২৪ সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) আয়োজিত মাসিক বক্তৃতার ১৪তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কানাডিয়ান মিউজিয়াম অব হিউম্যান রাইটসের বিশিষ্ট গবেষক ড. কাউসার আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এখানে তিনি মূলত একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির চ্যালেঞ্জ এবং কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটির ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন। ড. আহমেদ তার বক্তৃতার শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ১৯৭১ সালের গণহত্যার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার নৃশংসতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে বিদ্যমান। অথচ এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনও মেলেনি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাবে কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসই নয়, বরং মানবাধিকারের সর্বজনীন নীতিমালা ব্যাহত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, কানাডার মতো দেশে গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। কানাডার পার্লামেন্টে এই গণহত্যার বিষয়ে সঠিকভাবে তথ্য পৌঁছানো এবং স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমর্থন অর্জন করার জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ড. আহমেদ কানাডায় ১৯৭১ সালের গণহত্যার বিষয়ে কমিউনিটির জাগ্রত ভূমিকার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে বলেন, বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। তাই কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করতে প্রদর্শনী, সেমিনার, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তাসফিয়া তারান্নুম প্রভা
রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

গণহত্যার মানচিত্রায়ণ : শিবালয় উপজেলার মাঠকর্ম

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে সাক্ষী করে এখনো স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে কাতরাচ্ছে অজস্র মানুষ। চোখের সামনে থেকে স্বজনদের তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য কিংবা হত্যার দৃশ্য কখনো কি তারা ভুলতে পারবেন? তা হয়তো সম্ভব নয়। কেননা এইসব হত্যাকাণ্ডের বেশিরভাগই সংঘঠিত হয়েছে কখনো পাকিস্তানি ক্যাম্পে, কখনো রাস্তাঘাটে, আবার কখনো বাড়ির আঙিনায়, যা এখনো স্মৃতিবহ হয়ে আছে শহিদ পরিবারে অন্তরে অন্তরে। এমনই এক স্মৃতি বিজড়িত স্থান হল মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস কর্তৃক শিবালয় উপজেলায় সম্প্রতি দুইটি মাঠকর্ম পরিচালিত হয়। যেখানে গবেষকদের একটি নিবেদিত দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মানচিত্রায়ণে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। ড. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের দক্ষ নির্দেশনায় মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান লিমন, মো: ইমরান হোসেন রাহাত, এবং আরাফাত রহমানের নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের ত্রিশটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়; প্রতিটি স্থান ১৯৭১-এর মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ, অপহরণ, নির্যাতন এবং সশস্ত্র যুদ্ধের স্মৃতি বহন করে।

শিবালয় উপজেলার মাঠে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস। মাঠকর্মের মাধ্যমে সরাসরি জানা যায়, যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা সেখানকার দুটি বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। একটি হচ্ছে আমডালা বাজার, আরেকটি বাল্লা বাজার। সেখানে বেশকিছু প্রাণহানি হয় এবং সমস্ত দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এছাড়া বোয়ালিচক বধ্যভূমি, কয়রা, উথলী, তেওতা নামক স্থানেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় পাক হানাদার বাহিনী। এখানকার উপজেলা কেন্দ্রীয় আব্দুল গনি সরকার উচ্চ বিদ্যালয়কে দখল করে বানানো হয় টর্চার সেল। মাঠকর্মের মাধ্যমে এরকম আরো অনেক তথ্য উঠে আসে গবেষকদের হাতে।

বাল্লা বাজার এলাকায় গবেষক দল

মাঠকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ঐতিহাসিক সেই সকল স্থানের সঠিক জিপিএস রেকর্ড সংগ্রহ। ভবিষ্যতে নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য একটি নির্ভুল ও স্থায়ী রেকর্ড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, গবেষকরা প্রতিটি স্থানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে জিপিএস রেকর্ড করেন। তারা সেখানকার স্থানীয় জনগণ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলেন এবং ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারগুলো থেকে উঠে আসে পাকিস্তানিদের বর্বরতার নানা চিত্র এবং একই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতার দৃষ্টান্ত। গবেষণার জন্য ঐতিহাসিক সেই স্থানসমূহের ধারণকৃত ফটোগ্রাফগুলো দৃশ্যমান নথিপত্র হিসেবে কাজ করবে, যা ইতিহাস এবং বর্তমানের মাঝে একটি যুগান্তকারী সংযোগ স্থাপন করবে বলে গবেষকদের বিশ্বাস।

এই উদ্যোগটি প্রযুক্তি ও ঐতিহাসিক সংরক্ষণের মাঝে একটি সমন্বয় সাধন করে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে উজ্জীবিত রাখতে সহায়তা করবে। জিপিএস ডাটা, ফটোগ্রাফ এবং সাক্ষাৎকারসমূহ একটি ডিজিটাল মানচিত্র তৈরিতে সহায়ক হবে, যা শিক্ষার্থী, গবেষক এবং ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে সংযুক্ত করবে। এই সফল মাঠকর্মের মাধ্যমে গবেষকগণ তাদের গবেষণার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সংরক্ষণে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশাবাদী।

মো: ইমরান হোসেন রাহাত
ফিল্ড রিসার্চ ইন্টার্ন, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য : প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ পর্ব

ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্যের দ্বাদশ পর্ব প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এটা নিয়মিত প্রকাশনা। প্রতি পর্বে চারটি জেলার ভাষ্য নিয়ে প্রকাশিত এই গ্রন্থের রয়েছে নানামাত্রার বৈশিষ্ট্য। এ পর্বের জেলাগুলো হচ্ছে, লক্ষ্মীপুর, নরসিংদী, পাবনা ও ভোলা। ৬৪ জেলার মধ্যে এর আগে ৪৪ জেলার ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষ্যগুলো একাত্তরের গৌরবোজ্জ্বল বীরত্ব গাথার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা, নারী ও শিশুনির্যাতন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের দগদগে চিত্র বহন করে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও সেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহতা একটুও ম্লান হয়নি। নতুন প্রজন্মের সংগ্রহে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একাত্তরের প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে সংগৃহীত এই ভাষ্য ইতিহাসের অমূল্য উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। এগুলো একাত্তরের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এই ভাষ্য ব্যবহার করে বিশেষ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের পাঠ-গ্রহণ হয়ে উঠতে পারে সহজতর এক পন্থা।

প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্যের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নারী প্রত্যক্ষদর্শীর অংশগ্রহণ। প্রায় অর্ধেক বর্ণনাকারী নারী। এই নারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। বেশিরভাগ গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং একটি অকৃত্রিম বর্ণনা দিতে তারা সক্ষম হয়েছেন। নিকট অথবা একটু দূরের আত্মীয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক বা প্রতিবেশীদের নিকট থেকে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করেছে। এই সম্পর্কের সূত্রে ভাষ্যগুলো কৃত্রিমতাবর্জিত হতে পেরেছে।

এর আরেকটা বড়ো দিক হচ্ছে, কোনো চাওয়া-পাওয়ার কথা চিন্তা না করে নিরপেক্ষ ভাষ্যগুলো সংগ্রহকালে একাত্তরকে দারুণভাবে স্পর্শ করতে

প্রচ্ছদ শিল্পী: অশোক কর্মকার, মূল্য : ৩০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (বিক্রয় কেন্দ্র)

পেরেছে শিক্ষার্থীরা। তাদের বর্ণনা এই মতকে সমর্থন করে কারণ বহু সংগ্রহকারী শিক্ষার্থী উল্লেখ করেছে ভাষ্য সংগ্রহকালে পাকিস্তানি নির্যাতনের স্মৃতিতে বর্ণনাকারী চোখের জল আটকাতে পারেননি এবং সে নিজেও অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি। এখানে নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের একটা ব্যক্তিগত টুকরো কথায় একাত্তরের স্মৃতি প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে চলেছে অনন্য উপায়ে।

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর মনসা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রী লায়লা আনজুমান তার মা জেবুন নাহারের কাছে শুনে ভাষ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে জাদুঘরে। ভাষ্যের (সূত্র : ৩৮১৯) কিছু অংশ এরকম- "মা বলার প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তার চোখে পানি এসে গেল। পরে বলতে লাগলো, আমাদের বাড়ির সামনে ছিল পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। একদিন আমার নানি আমার মাকে একটি জঙ্গলে রেখে অন্য একটি বাড়ি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। হঠাৎ বাড়ি থেকে শোনা যায় গুলির আওয়াজ। আমাদের পাশের বাড়ির করিম চাচাকে পাকিস্তানিরা হত্যা করে। তারপর তার রক্তাক্ত লাশটা ফেলে রাখে তাদের ঘরের পাশে। হঠাৎ করে আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। মিলিটারি আমার নানার বাড়ির সামনেও আসলো। আমাদের দোকানগুলোর সামনে দুইজন লোককে হত্যা করলো। তখন আমার মা'র এক চাচাকে তারা বেঁধে ফেললো একটি গাছের সাথে। মায়ের চাচাকে মারধর করে। পরে আমার মামাকে তারা ধরে নিয়ে অনেক মারল নিষ্ঠুরের মতো। আর এইভাবে আমার মায়ের সামনে ঘটে গেল অনেক মানুষের মৃত্যু, যা আমার মা কখনও ভুলতে পারবে না। এই পর্যন্ত বলে মা কাঁদতে লাগল। বললো, তুমি আমাকে দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিলে, আমাকে যন্ত্রণায় জাগিয়ে তুললে।"

সন্তানের কাছে মায়ের এমন বিবৃতির পর মুক্তিযুদ্ধ উভয় প্রজন্মের কাছে খুব পরিষ্কার বার্তা দিতে পারে বলে মনে করি। আর এমন ভাষ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে জমা হয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার। ভাষ্যগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। প্রকাশিতব্য দ্বাদশ পর্ব অন্য পর্বগুলোর মতো পৌঁছে দেয়া হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পুর্বতন সকল সংখ্যার সাথে নতুন এই প্রকাশনাটি পাওয়া যাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রথম তলায় অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রে। ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে সন্ধান মিলবে গণমানুষের একাত্তরের স্মৃতি থেকে ইতিহাস হয়ে ওঠার হাজারও অসাধারণ নিদর্শন।

তাহুয়া লাভিব তুরা
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান
এনাটমি অব এ রেভ্যুলিউশন প্রামাণ্যচিত্র থেকে নেয়া স্থিরচিত্র

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, এম মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

নিউজউইক-এর সাংবাদিক আর্নড দ্য বোর্চগ্রেভ কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইস-লাম- এর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন

আলোকচিত্রী : মাক্ রিব

লিফলেট : ২৩ নভেম্বর ১৯৭১
জাতির উদ্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রদত্ত বেতার ভাষণ

দাতা: মতিউর রহমান

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সভায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী

আলোকচিত্রী : এম এ রায়হান

মুক্তিযুদ্ধকালে কার্যরত বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান

আলোকচিত্রী : এম এ রায়হান

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: লুৎফর রহমান খান

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম তখন থেকেই। আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখ আমি গ্রেফতার হই। এখন যেখানে সংসদ ভবন সেখানে আমাকে আটক রাখা হয় প্রথমে। সামরিক কোর্টে আমার বিচার হয়। পরে আমাকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একাত্তরের শুরুর দিকে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমার সাজার মেয়াদ শেষ হলে আমি মুক্তি পাই। পরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি পকেটে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ফার্মগেট তেজতুরি বাজারের বাসা থেকে নানান চড়াই উতরাই শেষে ফেনী সীমান্ত দিয়ে ভারতের আগরতলা রাজ্যে প্রবেশ করি। সেখানে নারায়ণগঞ্জের এমএলএ শামসুল হক সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকা যুব শিবিরে নাম লেখাই। আমরা সেই ক্যাম্পে সাত শত পঞ্চাশ জনের মতোন ছিলাম। ওখানে আট-দশ দিন থাকার পর আসামের শিলচর জেলার লায়লাপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমরা আড়াই শত ছেলে সেখানে জড়ো হলাম। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে আমরা মেজর খালেদ মোশারফের বাহিনীতে যুক্ত হই। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট হায়দার সাহেব। আরও একজন ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন হালিম সাহেব। যেহেতু আমি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরের মানুষ তাই আমাকে নব্বই জনের একটা গেরিলা দলের সাথে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিল নিজের এলাকায়। রাশিয়ান আর্ম, পিকে এবং গ্রেনেড নিয়ে এলাম আমরা। আমাদের সাথে মন্টু, খসরু, হোসেন ও সেলিম। মন্টুর বাড়ি ছিল ৩০২ এলিফেন্ট রোডে। আমরা এক সাথে জেলে ছিলাম। আমরা ছোট-বড় অনেক অভিযান পরিচালনা করেছিলাম। এর মধ্যে সিঙ্গাইরের গোলাইডাঙ্গা নামক একটা জায়গায় পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে ৮১ জন পাকসেনাকে খতম করি। আমরা ছোট ছোট ছৈ দেয়া কোসা নৌকায় মাত্র ৮৯ জন মুক্তিযোদ্ধা এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। শান্তিবাহিনীর একজন সদস্যের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমাদেরকে তিনিও নানা রকম তথ্য দিয়ে সহায়তা করতেন। তথ্যের ভিত্তিতে আমরা তিন দিক থেকে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করেছিলাম। বেশিরভাগের গলায় আর বুকে গুলিবিদ্ধ করতে পেরেছিলাম। বাকিরা নৌকা ডুবিতে মারা গেলো। ওরা নৌকায় করে গোলাইডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসেছিল। যেহেতু আমাদের কাছে তথ্য ছিল তাই আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে অন্য অনেক যুদ্ধেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়েছেন। ধামরাইতে নয়ারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে আমার এক সহযোদ্ধাকে চোখের সামনে শহিদ হতে দেখেছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর পাকবাহিনীর একটা বিরাট ক্যাম্প ছিল। আমরা যেদিন আক্রমণ করি ওরা আগে থেকে বুঝতে পেরে পালিয়ে গিয়েছিল। এটা সম্ভবত নভেম্বরের শেষের অথবা ডিসেম্বরের শুরুর দিকের ঘটনা। ওখানে আমরা অনেক অস্ত্র পেয়েছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ঢাকাতেই অবস্থান করি। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় আমিও রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম অন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে।

-শরীফ রেজা মাহমুদ

উইন্টার স্কুলের অভিজ্ঞতা

ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইংল্যান্ড-এর শিক্ষার্থী সামিহা সোহানার আঁকা কার্টুনে নবম উইন্টার স্কুলের স্মৃতি

নবম বার্ষিক উইন্টার স্কুলে অংশগ্রহণ করা ছিল সত্যিই এক অম্লান অভিজ্ঞতা। এটি সেন্টার ফর দা স্টাডি অব সেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (CSGJ) দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে এই প্রোগ্রামটি হয়েছিল। এর থিম ছিল 'জেনোসাইড স্টাডি : রেসপন্স এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস'। এই প্রোগ্রামটি শুধু শৈক্ষিক দিক থেকে আমাকে সমৃদ্ধ নয় বরং নিজেকে ভাবনাকে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

মৌসুমী ভৌমিক, ড. থেরেসা ডে ল্যাংগিস, ড. নাভরাস আফরিদি এবং ড. জেনিফার লিনিংয়ের মতো অসাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখতে পারা ছিল বিশেষ সুযোগ। এই কয়দিনে তাদের সাথে ক্লাসের বাইরে কথা বলতে পারা, তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারাও ছিল আমার জন্য সৌভাগ্যের। একটি ছোট এবং সাধারণ ঘটনা কিন্তু আমার হয়তো সবসময় মনে থাকবে ড. নাভরাস আফরিদির নম্রতা। তিনি কীভাবে শৌমিক দার প্লেট এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে এনে দিয়েছিলেন– সাধারণ কাজ, নম্র ব্যবহার এর প্রকাশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের সাথে কীভাবে সহজে মিশে যাওয়া যায়। আমার প্রিয় গায়িকা মৌসুমী ভৌমিকের সাথে দেখা হওয়াও একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল আমার জন্য। তার উপস্থিতি এবং জ্ঞান এই অভিজ্ঞতাকে আরও বিশেষ করে তুলেছিল। ক্লাসের বাইরে বন্ধুদের সাথে তৈরি হওয়া সম্পর্ক এবং ছোট ছোট মুহূর্তগুলোও এই অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে তুলেছে। আমার প্রিয় স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটি হলো বন্ধুদের সাথে ক্লাসরুম থেকে ডরমিটরিতে রাতের হাঁটা। চাঁদের আলোতে পুকুরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা সত্যিই জাদুকরী ছিল এবং এই স্মৃতিগুলো আমি সারাজীবন মনে রাখব।

উইন্টার স্কুলে কেবল শেখা নয় আমার কাছে এটি একটি যাত্রার শুরু এবং বন্ধুত্বেপূর্ণ স্মরণীয় সময়।

সামিহা সোহানা, অংশগ্রহণকারী, নবম উইন্টার স্কুল

আমেরিকার মৌখিক ইতিহাস সম্মেলনে একাত্তরের গণহত্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিহাসের অংশটিকেই পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গত মাসে অনুষ্ঠিত 'North American Oral History Association's Annual Conference'- এ তুলে ধরেন।

তার উপস্থাপনার জন্য কেস স্টাডি হিসেবে সে বেছে নেয় জল্লাদখানা বধ্যভূমির শহিদ পরিবারের সদস্যদের ওরাল হিস্ট্রি বা মৌখিক ভাষ্য। জল্লাদখানা হিসেবে পরিচিত এই বধ্যভূমিতে শহিদদের পরিচয় তাদের পরিবার এবং কিছু এলাকাবাসী জানলেও তা দেশের মানুষের কাছে ছিল অজানা। ১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই বধ্যভূমি খনন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে, একই সাথে শুরু করে এই বধ্যভূমির ইতিহাস এবং শহিদদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের কাজ। শহিদ পরিবার, এলাবাসী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মৌখিক বয়ান সংগ্রহ করা হয় এবং তৈরি হয় এখানে শহিদদের একটি তালিকা। উম্মুল মুহসেনিন তার অধ্যয়নের অংশ হিসেবে শহিদ পরিবারের সদস্যদের মৌখিক বয়ান সংগ্রহ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই ঐতিহাসিক বধ্যভূমিতে সংগ্রহ করা মৌখিক বয়ান পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ও অস্বীকার করা গণহত্যার বিপরীতে সাক্ষ্য দিচ্ছে। জল্লাদখানা নামটিও বিশেষত্ব বহন করে, পাকিস্তানি বাহিনী দেশব্যপী গণহত্যা চালালেও এই বিশেষ বধ্যভূমির নাম হয়ে যায় জল্লাদখানা, এটি তাদের সুপরিকল্পিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধের প্রমাণ। শহিদ পরিবারের সদস্যদের মৌখিক-ভাষ্য বলে দেয় কীভাবে এখানে বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করা হতো, পরিবারের সামনে হত্যা করে তাদের এখানকার কুয়োতে ফেলা হতো। উম্মুল মুহসেনিনের গবেষণা পশ্চিমা বিশ্বে বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি নির্দিষ্ট বধ্যভূমির সামগ্রিক তথ্য তুলে ধরে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রত্যাশা করে উম্মুল মুহসেনিনের মতো আরো নবীন গবেষকরা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রামাণ্যচিত্র পর্যালোচনা

বনি মা'র শিশুস্বর্গ

যুদ্ধ চলাকালে জন্মানো শিশুকে যুদ্ধশিশু বলে সম্বোধন করার নজির স্থাপিত হতে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। তারও প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার সময় 'যুদ্ধশিশু' বা 'ওয়ার বেবী' শব্দটি আরো করুণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। ১৯৭১-এর যুদ্ধ শিশুদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ান বনি ক্যাপোচিনো নামের কানাডার অধিবাসী একজন সমাজকর্মী। তার অবদানকে স্বীকার করে তৈরি 'মাদার অফ ওয়ার বেবী' স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্য চিত্রটি তাদের কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে তাদের সম্পর্কের গভীরতার জানান দেয়।

বনি ক্যাপোচিনো আর তাঁর স্বামী ফ্রেড ক্যাপোচিনো প্রথম কানাডায় বাংলাদেশের যুদ্ধ শিশুদের দত্তক নেওয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বনি ক্যাপোচিনো এবং তার দল ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই পনেরো জন ওয়ার বেবীকে নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে করে কানাডার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পনেরো জন যুদ্ধ শিশুর ভেতরে শিখা নামের একটি শিশুর আশ্রয় হয় স্বয়ং বনি ক্যাপোচিনোর আবাসে। যেখানে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ শিশুদের জায়গা হয়েছে। বনি ক্যাপোচিনো এখনো দুর্ভাগ্যগ্রস্থ শিশুদের জন্য কাজ করে চলেছে। চাইল্ড হেভেন নামে তার দত্তক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি স্থাপিত আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। অসহায় দুস্থ শিশুদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে। চাইল্ড হেভেন ইন্টারন্যাশনাল কানাডা এই কাজে অর্থ প্রদান এবং সাহায্য করে আসছে। তার বদৌলতে ২০০২ সাল থেকে শিশুস্বর্গ চট্টগ্রাম অসহায় শিশুদের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করে চলেছে।

বনি ক্যাপোচিনো ২০১৫ সালে বাংলাদেশে আসেন। সঙ্গে ছিলেন একাত্তরের যুদ্ধ শিশু শিখার কন্যা ক্যাটরিনা। তারা ২০ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং তাদেরকে এই প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এক ধরনের ঘরোয়া আবহ তৈরির মধ্য দিয়ে বনি ক্যাপোচিনোকে অভ্যর্থনা জানানোর আন্তরিক ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধকার একটি ঘরে তরুণদের তুলে ধরা প্রদীপের আলোয় বনি ক্যাপোচিনো পথ চিনে তাঁর আসন গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তরুণ প্রজন্মের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। দর্শক শ্রোতারা নিচে বসে বনি ক্যাপোচিনোর কথা শোনেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং অসহায় দুস্থ শিশুদের নিয়ে তার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করেন। শিশুদেরকে একটি স্বাভাবিক শৈশব এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বনি ক্যাপোচিনোর সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুদ্ধশিশু শিখার কন্যা ক্যাটরিনা তার মায়ের কথা দর্শক শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। শিখা সব সময়েই চেয়েছে তার মেয়ে যেন বাংলাদেশ এবং তাদের শিকড় সম্পর্কে অবগত থাকে। অতীতের কথা বলতে বলতে তাদের অনুভূতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে চোখের জলে। ক্যাটরিনা জানায় সে বাংলাদেশকে ঘুরে দেখতে চায় এবং বাংলাদেশের সাথে তার সম্পর্ক ও ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করে।

বনি ক্যাপোচিনো যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে অবগত। তিনি জানেন যুদ্ধ কত ভয়ংকর বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে কীরকম প্রভাব ফেলে। বনি ক্যাপোচিনো এবং তার স্বামী ফ্রেড ক্যাপোচিনো এইরকম যুদ্ধ শিশুদের জন্যই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের তৈরি প্রতিষ্ঠান 'শিশুস্বর্গ ইন্টারন্যাশনাল চট্টগ্রাম' বাংলাদেশে এখনো শিশুদের নিয়ে কাজ করে চলেছে। তারা স্থায়ী জমির খোঁজে রয়েছেন যাতে তারা আরো কার্যকরভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। বনি ক্যাপোচিনো বাংলাদেশের প্রতি তার ভালোবাসার কথা বলেন। তিনি ১৯৭২ সালে কীরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং কীভাবে পনেরো জন যুদ্ধ শিশুকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় সেই বিষয়ের উল্লেখ্য করেন। পৃথিবীর যেকোন দেশের অসহায় শিশুদের জন্য তারা সমানভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বনি ক্যাপোচিনো তার এই ব্যক্তিত্বের জন্য বাংলাদেশে 'বনি-মা' হিসেবে অধিক পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের তৈরি পনেরো মিনিট একচল্লিশ সেকেন্ডের এই স্বল্প দৈর্ঘ্য তথ্য চিত্রটির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বনি ক্যাপোচিনোর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাহিদুর রহিম চৌধুরীর পরিচালনায় এবং স্বজন মাঝির সহপরিচালনায় তৈরি এই তথ্য-প্রামাণ্য চিত্রটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের বয়ান, যা এই প্রজন্মকে বনি ক্যাপোচিনোর মতো মানুষের সাথে পরিচয় করায় এবং একই সাথে ভবিষ্যত-প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হয়।

রুরুমুনি রায় মজুমদার
স্বেচ্ছাকর্মী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

প্রামাণ্যচিত্র দেখতে স্ক্যান/ক্লিক করুন

https://www.youtube.com/watch?v=PbwH_zJrNKo

হিমালয়ের ইমজাৎসে শৃঙ্গে জাদুঘর-কর্মী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। বাঙালির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ রয়েছে হিমালয়ের মতোই বিশাল জায়গা জুড়ে। কাজের চাপে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন মনে মনে শুধু হিমালয়ের স্বপ্ন আঁকি। হঠাৎ করেই আবার ডাক পেলাম হিমালয়ের। শুরু হলো দিনগোনা। ৯ অক্টোবর সকালে মেঘের ভেলায় চেপে পৌঁছে গেলাম পর্বতারোহীদের স্বপ্নভূমি হিমালয়ের দেশ নেপালে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে ছোট্ট একটা প্লেনে করে পৌঁছে যাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর বিমানবন্দর তেনজিং হিলারি বিমানবন্দরে। লুকলা থেকে শুরু হয় ট্রেকিং। সারাবিশ্বের হাজার হাজার পর্যটকের সমাগম ঘটে এই পথে। শহুরে যান্ত্রিকতা-কোলাহল ছেড়ে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের টানে পথের ক্লান্তি মুছে নিতে পর্যটকরা বেছে নেয় এই পথ। অচেনা মানুষগুলোও আপন করে নেয়। নেপালী শিশুদের 'নামাস্তে' সম্বোধন পথটাকে আরও স্বর্গীয় করে তোলে। এগিয়ে চলি কাঁধে সাড়ে ষোল কেজির ব্যাকপ্যাক নিয়ে। হিমালয়ের সৌন্দর্যে সারাদিনের ক্লান্তি ম্লান হয়ে যায়।

-ইয়াছমিন লিসা

গ্রন্থ পর্যালোচনা

দেয়াল দিয়ে ঘেরা

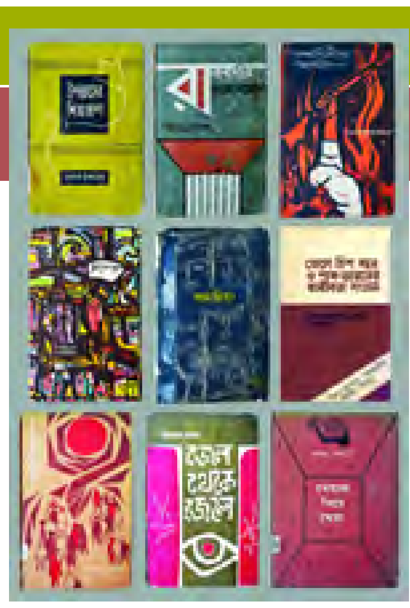

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক ছিল পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে ক্রান্তিকালের দশক। এসময় বহু মুক্তিসংগ্রামী মানুষকে জেলখানায় রাজবন্দী থাকতে হয়েছে। রাজবন্দী এসব মানুষের অনেকেই লেখালেখি করেছেন জেলে বসে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ১ নম্বর গ্যালারিতে এমন কতক রাজবন্দীর সাহিত্য চর্চার নিদর্শন রয়েছে। এবারের গ্রন্থ পর্যালোচনা রাজবন্দী মতিয়া চৌধুরীর বই *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সম্মুখ সারিতে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়া চৌধুরী। তিনি আগে থেকেই রাজনীতিতে সক্রীয় ছিলেন। ১৯৬৭ সালে 'অগ্নিকন্যা' নামে খ্যাত মতিয়া চৌধুরীর নেত্রকোনায় এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আপত্তিজনক বা বিপজ্জনক মনে করে। যার কারণে গ্রেফতার হতে হয় তাকে। দেশরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় বিনা বিচারে তার তিন মাসের আটকাদেশ হয় এবং যা তিন মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রথমে ঢাকা জেল পরে ময়মনসিংহ জেল এবং আবার ঢাকা জেলে তিনি বন্দি ছিলেন। মতিয়া চৌধুরীর এই দীর্ঘ জেল জীবনের নিত্যকার বর্ণনা নিয়েই 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা'।

মতিয়া চৌধুরী ময়মনসিংহ জেলে ছিলেন রাজবন্দী হিসেবে। ফিমেল ওয়ার্ডে যে কয়েদিরা ছিলেন তার মধ্যে মতিয়া চৌধুরী কাই ছিলেন রাজবন্দী। রাজবন্দী হওয়ার কারণে জেলের অন্যান্য কয়েদিদের মত তাকে কাজ করতে হত না। কিন্তু রাজবন্দী হয়েও তিনি সে সকল কয়েদীদের সাথে মিশেছেন সাধারণ হয়ে। তাদের গল্প শুনেছেন, প্রয়োজনে পাশে থেকেছেন। যার কারণে সব কয়েদিরাই তাকে সম্মান করতেন। জেলে অনেক সময় অনেকে অসুস্থ হলেও জমাদারনীরা তেমন গুরুত্ব দিত না। সে সময়ে জমাদারনীকে বলে তাদের ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

ময়মনসিংহ জেলখানায় নতুন কয়েদিরা কী কারণে জেলে এলো, কত দিনের জন্য এলো এইসব বিষয়ের আগ্রহ ছিলো মতিয়া চৌধুরীর। ফলে প্রথম থেকেই সবার সাথে সখ্যতা গড়ে উঠতো। যার কারণে জেলের সবাই হয়ে উঠতো পরিবারের মত। জেলের কয়েদি মিনু, লালবানু, জমিলা, আয়েশা, আম্বিয়া, আনোয়ারা, গামরী, জরিনা, রহিমা, সুফিয়া, আলেকা, লতিফা, ফাতেমা এদের প্রত্যেকের গল্পই হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল মতিয়া চৌধুরীর। এই যেমন তার দেখাশোনা করা কয়েদি গামরী যখন তার সাজা শেষ করে মুক্ত জীবনে ফিরে যাচ্ছিল তখন মতিয়া চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'মার লাগি মন পুড়ে'।

প্রথম দিকে একটুও ভালো লাগতো না তার। তাই মাঝে মাঝেই করতেন স্মৃতিচারণ। পার্থক্য বুঝেছিলেন প্রথমবার গ্রেফতার হয়ে রংপুর জেলের ২০ দিন কাটানোর সাথে ময়মনসিংহ জেলের এই দীর্ঘ সময় থাকার অভিজ্ঞতার। যে দিনগুলোতে ডাক্তার দেখানোর জন্য জেলের বাইরের হাসপাতালে যেতেন সেই দিনগুলো ছিল তার জন্য আনন্দের। বাইরের মুক্ত হাওয়ার সাথে কোন কোন দিন ফেরার সময় দেখতে পেতেন গ্রামের মেলা। যা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেত শৈশবের দিনগুলোতে। বন্দীজীবনে যা তাকে প্রফুল্ল থাকার রসদ দিতো।

অবসরে ময়মনসিংহ জেলে করেছিলেন ফুলের বাগানও। গাছের চারা এনে লাগানো, পানি দেওয়া, গাছেদের যত্ন নেওয়া সব করেছেন আগ্রহ নিয়ে। বই পড়তে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু রাজবন্দী হওয়াতে সব সময় বই পেতেন না। যার জন্য একই বই পড়তেন কয়েকবার করে। মাঝে মাঝে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সেলের জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া অশ্বথ গাছটার দিকে।

গ্রীষ্মের শেষ সময়ে ময়মনসিংহ জেলে এসেছিলেন মতিয়া চৌধুরী। এখানেই দেখেছেন একে একে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং শীতের চলে যাওয়া। এরপর বদলি হয়ে যান ঢাকা জেলে। ঢাকা জেলে বদলি হওয়ার পরে দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। খবরের কাগজে মানুষের রুখে দাঁড়ানোর খবর দেখতে পান। জেলের ভিতর থেকে শুনতে পান মিটিং-মিছিলের স্লোগান। তখন নিজেকে চার দেয়ালে আবদ্ধ দেখে মন খারাপ হতো নিজে সেখানে নেই বলে। দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইতেন তিনি। মিছিলে পা মেলানো, সংগ্রামে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা থেকেই বলেছিলেন 'চৌদ্দ ফুটের দেয়াল সংগ্রামকে রুখতে পারেনি'।

ময়মনসিংহ জেলে থাকাকালীন নিজের অসুবিধার কথা খুব একটা না বললেও বলেছেন সেখানকার সাধারণ নারীদের কথা। সুযোগ ছিল শর্ত সাপেক্ষে মুক্তিরও কিন্তু নিজের স্বার্থে এসব তিনি কিছুই করেননি। দেশের কথা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের কথা ভেবেই বিনা বিচারে জেল খেটেছেন। যার সামগ্রিক রূপই হচ্ছে *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*।

দ্বীপ হালদার
অডিও ভিজ্যুয়াল সহকারী, শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র

তরুণদের গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এই মধ্যবর্তী প্রতিবেদন উপস্থাপন কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ গবেষকগণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে নিজেদের গবেষণার গভীরে গিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষণীয় দিক নির্দেশনার সুযোগ পায়। অনুষ্ঠানে মোট ১২টি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশের গণহত্যার ইতিহাস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস নিশ্চিতকরণ, বাংলাদেশ জেনোসাইড ম্যাপিং, ১৯৭১ সালে বিহারিদের নির্যাতন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘৃণ্য অপরাধ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসব গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

২০২৪ সালের জুন মাসে শুরু হওয়া এই ফেলোশিপের মাধ্যমে ১২টি দল নিজেদের মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি করতে কাজ করছে। এই ফেলোশিপের মাধ্যমে গবেষকগণ শুধু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং তথ্যের বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন এবং বর্তমান সমাজে তার প্রভাব কেমন হতে পারে তা নিয়েও চিন্তার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোকে উদঘাটন করার লক্ষ্যে জাদুঘরের পাঠাগার এবং অন্যান্য সুবিধাদি ব্যবহার করে গবেষকগণ নিরলসভাবে তাদের গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে বিগত কয়েক মাস ধরে তাদের গবেষণার ওপর নিবিড়ভাবে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের এই গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক ইতিহাসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হবে বলে মনে করা যায়।

এখানে ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান আকর-উৎস এবং দেশের ইতিহাসকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তৈরি করছে। এই ধরনের ফেলোশিপ কার্যক্রমগুলো শুধু ইতিহাসকে সংরক্ষণই করে না বরং নতুন প্রজন্মের গবেষকদের মধ্যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। এতে করে গবেষকরা বুঝতে পারছে যে তাদের গবেষণা কেবল তাদের ক্যারিয়ারের জন্যই নয় বরং দেশের ইতিহাসকে নতুনভাবে পর্যালোচনা এবং বৈশ্বিক স্তরে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাসনিম তারান্নুম প্রজ্ঞা
স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

তোমার চোখে সুলতানার স্বপ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করবে। এভাবে বইটি ঘিরে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এক পাঠ-প্রতিক্রিয়া প্রতিযোগিতা। যার মূল বিষয়– 'তোমার চোখে সুলতানার স্বপ্ন-এর প্রাসঙ্গিকতা'। বই পাঠের পর পাঠক-পাঠিকারা অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখিত প্রতিক্রিয়া জমা দেবে। বিজয়ী পাঠকরা পাবে বই উপহার এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পাবে ইউনেস্কোর লোগোসম্বলিত সনদপত্র। উল্লেখ্য গত ৮ মে ২০২৪ রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রস্তাবনায় ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারে শোকের ছায়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার গভীর শোক এবং বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অফিস সহকারী আব্দুর রশিদ গত ২১ অক্টোবর ২০২৪ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ তিন দশক ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে। মিষ্টভাষী, সদা-হাস্যোজ্জ্বল, দায়িত্বশীল এই কর্মীর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাথে জাদুঘর সহমর্মিতা প্রকাশ করছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন রশিদ ভাই। জাদুঘরের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মকাচীর সাথে ছিলো তার গভীর সম্পর্ক। কর্মীরা তাকে মোল্লা ভাই, মোল্লা নানা, মোল্লা চাচা একেক জন একেক বিশেষণে সম্বোধন করতেন। ঢাকা শহরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে কোনো সুহৃদের নাম ঠিকানা রশিদ ভাইয়ের মুখস্থ ছিলো। অফিস সহকারী হিসেবে জাদুঘরের পত্রাদি পৌঁছে দিতেন বলে সকলের সাথে ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৮/২৯ বছরের সকল কর্মকাণ্ডে আব্দুর রশিদের অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের মোল্লা ভাই আব্দুর রশিদ

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের বয়স ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন কোন সরকার মুক্তিযুদ্ধের মহান ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়াস নেয়নি তখন আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৯৪-৯৫ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিলেন।

১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার যাত্রা শুরু করে ৫ সেগুনবাগিচায় গাছগাছালিতে ভরা একটি পুরানো ঐতিহ্যবাহী আড়াই তলা বাড়িতে।

আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়োগ পাই ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ। ভয়কাতর আমি যথারীতি সকাল ১০টার আগেই অফিসে পৌঁছে যাই। তখন সদস্য-সচিব ছিলেন আক্কু চৌধুরী। তিনি আমাকে আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। গ্যালারি সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ ও সাথে সাথে আমাকে আইডি কার্ড দেয়া হয়। গ্যালারিতে যেয়ে দেখি মুখে দাড়িওয়ালা ছোটখাটো একজন লোক গাল ভর্তি পান চিবুচ্ছেন। সালাম দিলাম, তিনি বললেন আপনি নাসির ভাই, আক্কু স্যার আমাকে আগেই বলেছেন।

তিনিই রশিদ ভাই জাদুঘরের অফিস সহকারী। যিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাবতীয় কাজ করেন। তখন অফিস সময় ছিলো সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে ৬টা ৩০ মিনিট, রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। রশিদ ভাই অত্যন্ত ভালো, সৎ ও দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন। তিনি সকাল ৮টায় অফিসে এসে প্রথমে গ্যালারি খুলে দিতেন। চা-নাস্তা খেয়ে পুরো বাড়ির আঙ্গিনা এবং একে একে ৬টি গ্যালারি ঝাড়ু দিতেন। আমি তার সাথে থাকতাম। রশিদ ভাই এমন একজন মানুষ ছিলেন তার তুলনা তিনি নিজেই। কারো সাথে কথা বলার আগেই সালাম দিতেন এবং মুখে সব সময় হাসি থাকতো আর থাকত পান। পান একটা মুখে তো ৫টা পকেটে। তখন গ্যালারিতে ৬ জন গাইড ও গ্যালারি সুপারভাইজার হিসেবে আমি থাকতাম। দুপুরে

খাবারের সময় বড় সমস্যা হলো কে কখন খেতে যাবে কারণ গ্যালারি ফাঁকা রেখে যাওয়া যাবে না এটাই ছিলো নিয়ম। গাইড হিসেবে গ্যালারিতে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীরা ছিলো। ওরা হলে থাকে, রান্না করা খাবার কেউ আনতো না। এখানেও রশিদ ভাইয়ের আন্তরিকতার কথা ভোলার মতো নয়।

একদিন রশিদ ভাই বললেন আফারা আপনেরা সবাই ১০ টাকা কইরা দেন আমি খাবার নিয়ে আসি। সবাই ১০ টাকা করি দিলাম, রশিদ ভাই খাবার নিয়ে এলেন– ১টি বনরুটি, ১টি ডিম ভাজি ও ১টি কলা। তখন এটিই ছিলো আমাদের ১০ টাকার খাবার। এখনকার খাবারের ব্যবস্থাপনায়ও ছিলো রশিদ ভাই। ৫ সেগুন বাগিচায় যে বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিলো সেই বাড়িতে আগে একটি পত্রিকার অফিস ছিল। জাদুঘর শুরু হওয়ার পরও প্রিন্টিং প্রেসের অনেক যন্ত্রপাতি সেখানে ছিলো। সেই প্রেসের যন্ত্রপাতি সরানোর জন্য রশিদ ভাই, আমি ও মতিন ভাই অনেক পরিশ্রম করেছি। সময়-অসময়ে গভীর রাতেও জাদুঘরের যে কোনো প্রয়োজনে রশিদ ভাইকে পাওয়া যেত। জাদুঘরের যে কোনে মেরামতের কাজ করার সময় সামনের সারিতে থাকতেন তিনি। জাদুঘরের চাবি বহন করতে করতে তার শার্ট-প্যান্টের পকেট ফুটো হয়ে যেতো।

রশিদ ভাই কোনো বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। দায়িত্বের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত অবিচল। জাদুঘরের কোনো কর্মীর আত্মীয়স্বজন এলে রশিদ ভাইয়ের আপ্যায়ন পান নাই এমন কোন নজীর নেই। রশিদ ভাইয়ের অহংকার ছিলো না। জাদুঘরের প্রতিটি কর্মী তার কাছে সহযোগিতা পেয়েছে। তিনি জীবনে কারো ক্ষতি করেননি বরং উপকার করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীদের চাহিদা মাফিক দুপুরের খাবারের বাজার রশিদ ভাই নিয়মিত করেছেন আতন্তরিকতার সাথে। তার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন হলো গত কয়েক মাস ধরে মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায়। তিনি গত ২১ অক্টোবর ২০২৪-এ লক্ষীপুর জেলার রায়পুর থানার নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। একই তারিখে আগের বছর তার স্ত্রীও ইন্তেকাল করেন। আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবার তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট আকুল আবেদন রশিদ ভাই যেন ভালো থাকেন, শান্তিতে থাকেন।

কে এম নাসির উদ্দিন
কর্মী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ | ডকুমেন্টারি ফিল্ড ওয়ার্ক ২০২৫

৫ দিন। জানুয়ারি ২, ৩, ৪, ১০ ও ১১

আপনি কি চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে আগ্রহী? মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভাল উপকরণ ও ঘটনা চলচ্চিত্রে সৃজনশীলভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান? কিংবা একাডেমিক চর্চায় ডকুমেন্টারি ফিল্মের সমন্বয় ঘটাতে চান?

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আপনি ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী ধারনা অর্জনের পাশাপাশি ক্যামেরা চালনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে ৩-৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪
যোগ্যতা: যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক (১৮-৩০ বছর)
আসন সংখ্যা: ২৫টি
ক্লাস: সর্বমোট ৫ দিন

নিবন্ধন ফি : ১,৫০০ টাকা (শিক্ষার্থীদের জন্য ১,০০০ টাকা)
ঢাকার বাইরের নির্বাচিত আবেদনকারীদের কোন নিবন্ধন ফি দিতে হবে না।

আবেদনের জন্য QR কোর্ড স্ক্যান করুন

সফল অংশগ্রহণকারীগণ ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য Exposition of Young Film Talents (EYFT) ল্যাবে আইডিয়া উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন। EYFT হলো তাত্ত্বিক, কলাকৌশলগত ও বাস্তব সহায়তা প্রকল্প যেখানে ২-৫ জন নির্মাতাকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণে প্রণোদনা যোগানো হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৪৮১১৪৯৯১-৩
mukti.jadughar@gmail.com

‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’ গানের সুরকার

শেখ লুতফর রহমান স্মরণ

‘শুধু এই ছেলে নয়, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যুবকদেরও গাইতে হবে এমন গান, জাগিয়ে তুলতে হবে দেশের মানুষকে। শয়তানদের শয়তানী মোকাবেলা করতে হবে। গান শিখতে সকলে তোমার কাছে যাবে, তুমি শিখাবে এসব গণসংগীত।’ ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ লুতফর রহমান গান গাওয়ার পর মাওলানা ভাষানী তাকে জড়িয়ে ধরে এ কথা বলেন।

কালজয়ী গণসংগীত ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’-এর সুরকার শেখ লুতফর রহমানের জন্ম ১৯২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাতক্ষীরার সুলতানপুর গ্রামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম তেতাল্লিশের মনন্তর। এসময়েই তিনি আইপিটিএ'র সাথে সম্পৃক্ত হন। তরুণ চোখে দেখেছেন দেশভাগ পূর্বাপর ভয়াবহ দাঙ্গাসমূহ। পরে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে সাংস্কৃতিক সংগ্রামে যুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শুরুর পর্বে আনিসুল হক চৌধুরীর ‘ঘুম পাড়ানি গান আজি নয়’, ‘ওগো বৈশাখী ঝড়, ‘ওরে ভাইরে ভাই, বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই’ গীতিকবিতা এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী বিদ্রোহী কবিতায়ও তিনি সুরারোপ করেন।

পূর্ববাংলায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে তিনি সৃষ্টি করেন আরেক গণসংগীত ‘প্রেমের পৃথিবী কার অভিশাপে হল আজ মরুময়’। শেখ লুতফর রহমানকে ঘিরে মাওলা ভাসানীর প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে।

১৯৫২ সালে আনিসুর রহমান রচিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম গণসংগীত– ‘শোনেন হুজুর, বাঘের জাত এই বাঙালেরা জান দিতে ডরায় না’। ১৯৫৪ সাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি গণসংগীত পরিবেশন করেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর সব রকমের সভা-সমাবেশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসনের মধ্যে কার্জন হলে আয়োজিত একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপন হয় নানা বাধা নিষেধ উপেক্ষা করেই। এই বাধা নিষেধের বেড়াজালে গণসংগীত সৃষ্টিতেও কিছুটা ভাটা পড়ে। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র নামক নির্বাচনের বছর সমকাল পত্রিকার সম্পাদক কবি সিকান্দার আবু জাফরের ‘জনতার সংগ্রাম চলবে’ কবিতাটি রচনা করেন। ইত্তেফাক পত্রিকার উপসম্পাদকীয় পাতায় সেটি ছাপা হলে, কামাল লোহানী কবিতাটি শেখ লুতফর রহমানের কাছে নিয়ে যায় সুরারোপের উদ্দেশ্যে।

প্রথমে তিনি কবিতার কথাগুলো সুর সৃষ্টির জন্য কঠিন বলে অপারগতা প্রকাশ করলেও পরে কিছুটা গান উপযোগী সহজ শব্দে বদল করে নিয়ে তাতে সুরারোপ করেন। এভাবেই জন্ম লাভ করে অমর গণসংগীত ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’। পরবর্তীতে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে, মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে অনুপ্রেরণা জোগায় এই গান। কালজয়ী গানটির সুরকার শেখ লুতফর রহমান ১৯৯৪ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান শিল্পীর প্রয়াণ মাসে আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি।

–শরীফ রেজা মাহমুদ

২০২১ সালে যুক্তরাজ্যে শেখ লুতফর রহমান জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’ গানের ভিডিও কন্যা লুসি রহমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান/ক্লিক করুন

https://www.youtube.com/watch?v=qTWv9f1mXkw

প্রয়াত কর্মী আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানা স্মরণ

সম্প্রতি প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দুই কর্মী আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানার প্রয়াণে গত ২৮ অক্টোবর ২০২৪ সোমবার জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড. সরওয়ার আলী, মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমিন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যসহ জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ।

শুরুতে আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ট্রাস্টি ড. সরওয়ার আলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শক্তি হচ্ছে এখানের যারা কর্মী আছে তাদেরকে নির্ভার হয়ে বিশ্বাস করা যায়। জাদুঘরের শুরু থেকেই রশিদ ছিল এবং সব কাজই করেছে নিষ্ঠার সাথে। নাজমা প্রতিদিনই সঠিক সময়ে এসে কাজে বসতো এবং নিভৃতে তার কাজ করে গেছে। তারা যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন সেটা অনুকরণীয়।

ট্রাস্টি মফিদুল হক প্রয়াতদের স্মরণ করে বলেন, তাদের যে আন্তরিকতা, যে নিষ্ঠা এবং নীরবেই তারা জাদুঘরকে সেবা প্রদান করে গেছে তার মর্যাদা রাখতে হবে এবং তাদের স্মৃতি যেন জাদুঘরের অংশ হয়ে থাকে সেটাও ভাবতে হবে। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন ‘যারা জাদুঘরে আছেন তারা সবাই জাদুঘরকে নিজের পরিবার বলে মনে করেন। আব্দুর রশিদ এবং নাজমা সুলনাও পরিবারের মত করে জাদুঘরের কাজ করেছেন, সেবা দিয়েছেন। সঞ্চালক ও ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম আব্দুর রশিদ স্মরণে বলেন, রশিদ ভাই ছিলেন জাদুঘরের প্রথম কর্মী, যিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সজ্জন, দায়িত্বশীল এবং যার উপরে যে কোন দায়িত্ব দিয়ে নির্ভার থাকা যায়। এরপরে ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ তাদের স্মরণ করে বলেন, ওনাকে যে কোন কাজের কথা বললে না করতেন না সেটা যত রাতই হোক। নাজমা সম্পর্কে তিনি বলেন নাজমা কখোনোই ১০টার পরে আসতেন না এবং কোন কারণে দেরি হলেও সেটা ফোন করে জানাতেন। জাদুঘরের সহযোগী ব্যবস্থাপক মো: কামাল উদ্দিন আব্দুর রশিদের স্মৃতিচারণা করে বলেন, আমি জাদুঘরে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই রশিদ ভাইকে দেখতাম উনি টিকেট কাউন্টারে বসতেন, ঝাড়ু দিতেন এবং পরে জাদুঘর খোলা ও বন্ধ করার কাজও করেছেন। নাজমাকে দেখেছি টিকেট কাউন্টারের কাজ দায়িত্ব নিয়ে করেছেন। কখনো দায়িত্বে অবহেলা করেন নাই।

এছাড়াও আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানার স্মরণে কথা বলেন আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানার পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ। এ সময় প্রত্যেকেই আব্দুর রশিদ ও নাজমা সুলতানার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official